

সমকাল
প্রথম
ভারত সবার আগে
কলকাতা
খবরে প্রথম

SOMOYER PROTHOM KOLKATA
www.youtube.com/PROTHOMKOLKATA
(www.somoyerprothomkolkata.com)



Volume - I Issue - 12 ■ PRGI No.: WBBEN/26/A4351 ■ North 24 Parganas ■ 16 November 2026 ■ Price Rs. 5/-

একাই একশ শুভেন্দু অধিকারী



সোমা মাইতি

নবান্ন থেকে উত্তরকন্যা, পুরশুড়া থেকে নন্দীগ্রাম। নভেম্বরের প্রথম দু'সপ্তাহে একের পর এক কর্মসূচি মুখ্যমন্ত্রীর। বকেয়া ডিএ, আবাসের টাকা, কৃষকদের সহায়তা, নিয়োগের ঘোষণা। প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের পাশাপাশি বিরোধীদের উদ্দেশেও কড়া বার্তা।

নভেম্বরের প্রথম দু'সপ্তাহে কখনও নবান্ন, কখনও উত্তরবঙ্গ। আবার হুগলি থেকে নন্দীগ্রাম। সরকারি কর্মসূচি, প্রশাসনিক বৈঠক কিংবা রাজনৈতিক বক্তব্য;সবেতেই সক্রিয় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। একদিকে সরকারি প্রকল্পে অর্থ বরাদ্দ, অন্যদিকে দুর্নীতির অভিযোগে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি। এরই মধ্যে কর্মসংস্থান, কৃষি এবং আইনশৃঙ্খলা নিয়েও একাধিক সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন তিনি।

৩ নভেম্বর শিলিগুড়ির উত্তরকন্যায় প্রশাসনিক বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে বন্ধ চা-বাগানের ১৯ হাজার ৫২৪ জন শ্রমিককে এককালীন পাঁচ হাজার টাকা করে দেওয়ার কথা জানান। মোট ব্যয় প্রায় ৯ কোটি ৭৬ লক্ষ টাকা। পিটিআইয়ের প্রতিবেদন অনুযায়ী, শ্রমিকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি টাকা পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়। পাশাপাশি মাসিক চালের বরাদ্দ ৩৫ কেজি থেকে ৫০ কেজি করার প্রস্তাব বিবেচনার কথাও জানান শুভেন্দু অধিকারী।

পরদিন, ৪ নভেম্বর পঞ্চায়েত দফতরের পর্যালোচনা বৈঠক থেকে নতুন নিয়োগের ঘোষণা। ২০২৭ সালের এপ্রিলের মধ্যে ৭ হাজার ১৯০টি পদে নিয়োগের লক্ষ্য নিয়েছে সরকার। আরও এক হাজার অস্থায়ী কর্মী নিয়োগের পরিকল্পনাও রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, নিয়োগের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে সরকারি নিয়মে পরিবর্তন আনা হবে। নিয়োগ প্রক্রিয়ায় দায়িত্ব থাকবে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের।

ওই দিন রাতেই নবান্ন থেকে সরকারি কর্মচারীদের বকেয়া মহার্ঘ ভাতা নিয়ে বড় ঘোষণা আসে। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, মোট ১২ হাজার কোটি টাকার মধ্যে আগের ও বর্তমান সরকার মিলিয়ে আট হাজার কোটি টাকা মেটানো হয়েছে। বাকি চার হাজার কোটি টাকা ৩০ নভেম্বরের মধ্যে দেওয়ার আশ্বাস দেন তিনি। অনুদানপ্রাপ্ত সংস্থার কর্মীদের ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্ট নিযুক্ত কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানান।

৫ নভেম্বর হুগলির পুরশুড়ায় কৃষকদের কর্মসূচিতে যোগ দেন মুখ্যমন্ত্রী। উদ্বোধন করেন 'মুখ্যমন্ত্রী কৃষক সম্মান নিধি' প্রকল্প। আলুচাষিদের ভিন্নাজ্যে পণ্য পরিবহণে প্রতি কুইন্টালে ৫০ টাকা ভর্তুকির ঘোষণা করেন। বেকার যুবক-যুবতীদের জন্য 'ভরসা' প্রকল্প আনার কথাও জানান। ২০২৭ সালের ৮ মে-র মধ্যে এক লক্ষ চাকরির ব্যবস্থা করার লক্ষ্য পুনর্ব্যক্ত করেন তিনি।

এর মধ্যেই পুরভোট নিয়ে রাজনৈতিক বিতর্কে সরব হন শুভেন্দু অধিকারী। ১০ নভেম্বর নন্দীগ্রামে সাংবাদিকদের প্রশ্নে বলেন, ''আমরা সময়ে নির্বাচন করতে চাই।'' বিরোধীদের বিরুদ্ধে নির্বাচন আটকানোর চেষ্টার অভিযোগ তুলে ভোট না

➲ তিন পাতায়

হাসিনা, ডিসেম্বর এবং না



সুব্রত আচার্য

ডিসেম্বরে দেশে ফেরার ঘোষণা শেখ হাসিনার। পাসপোর্টের অনুরোধেও সাড়া মেলেনি। প্রত্যর্পণ চাইছে ঢাকা। নিরাপত্তা ও বিচারের নিশ্চয়তা নিয়ে দিল্লির সম্ভাব্য দুই শর্তের খবর প্রকাশ্যে। কেন ডিসেম্বরেই শেখ হাসিনার বাংলাদেশে ফেরা কঠিন? তিনটি কারণে আটকে প্রত্যাবর্তনের পরিকল্পনা।

ডিসেম্বরে বাংলাদেশে ফিরবেন শেখ হাসিনা। ঘোষণা তাঁর নিজের। কিন্তু দেশে ফেরার নির্দিষ্ট দিন নেই। নেই প্রত্যাবর্তনের কোনও ঘোষিত ব্যবস্থা। উল্টে পাসপোর্টের অনুরোধ ঘিরে নতুন জটিলতা। দিল্লি ও ঢাকার কূটনৈতিক অবস্থানেও বিস্তর ফারাক। ফলে প্রশ্নটা শেখ হাসিনা ফিরতে চান কি না, সেখানে আটকে নেই। কোন পথে ফিরবেন? কে দায়িত্ব নেবে? আর ডিসেম্বরের মধ্যেই সেই ব্যবস্থা হবে কীভাবে?

ডিসেম্বরের পথে শেখ হাসিনার সামনে তিন বাধা।

প্রথম কারণ পাসপোর্ট চাইলেই দেশে ফেরার পথ খুলছে না

৯ নভেম্বর রয়টার্স জানায়, নতুন বাংলাদেশি পাসপোর্ট ও জাতীয় পরিচয়পত্র চেয়ে দিল্লির বাংলাদেশ হাইকমিশনে চিঠি পাঠিয়েছেন শেখ হাসিনার আইনজীবীরা। লন্ডনভিত্তিক ম্যাট্রিক্স চেম্বার্সের পাঠানো চিঠিতে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার অনুরোধ জানানো হয়। শেখ হাসিনার সহযোগীদের বক্তব্য, প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতা শেষ হলেই দেশে ফেরার দিন ঘোষণা করা হবে।

কিন্তু চিঠি ঘিরেই প্রথম প্রশ্ন।

বাংলাদেশ হাইকমিশনের প্রেস মিনিস্টার সাইদুর রহমান জানান, আইনজীবীরা শেখ হাসিনার অনুমোদন নিয়ে চিঠি পাঠিয়েছেন কি না, তার প্রমাণ পাওয়া যায়নি। বিষয়টি যাচাইয়ের জন্য ঢাকায় পাঠানো হয়েছে। ১০ নভেম্বর সরকারি সংবাদ সংস্থা বাসসকে তিনি আরও জানান, এই চিঠিকে আনুষ্ঠানিক পাসপোর্ট আবেদন হিসেবে দেখানো ঠিক নয়।

এদিকে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনালের প্রধান কৌঁসুলি আমিনুল ইসলাম জানিয়েছেন, মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত পলাতক আসামিকে নতুন পাসপোর্ট দেওয়ার আইনি সুযোগ নেই। শেখ হাসিনাকে ফিরতে হলে ভারত-বাংলাদেশ প্রত্যর্পণ চুক্তির পথেই আসতে হবে।

এখানেই প্রথম ফারাক। শেখ হাসিনার আইনজীবীরা চাইছেন ভ্রমণের কাগজপত্র। ঢাকা চাইছে প্রত্যর্পণ। দুটি সম্পূর্ণ আলাদা আইনি প্রক্রিয়া।

ভারতের বিদেশ মন্ত্রকও প্রত্যর্পণকে আইনি বিষয় বলেছে। ফলে ফেরার ঘোষণা আছে। কিন্তু ফেরার আইনি পথ এখনও অনিশ্চিত।

দ্বিতীয় কারণ দিল্লির দুই শর্ত, ঢাকার কঠিন পরীক্ষা

১৩ নভেম্বর বিবিসি বাংলার প্রতিবেদন ঘিরে নতুন করে আলোচনায় আসে শেখ হাসিনার প্রত্যাবর্তন। ভারতীয় প্রশাসনিক ও সামরিক সূত্রের বক্তব্য তুলে ধরে প্রতিবেদনে দুটি

➲ তিন পাতায়



'তোলাবাজি রুখো', কঠোর বিজেপি!

রিমিতা রায়

দলের পতাকা ব্যবহার করে অরাজকতা নয়। তোলাবাজির অভিযোগ পেলে এফআইআর করার নির্দেশ শমীক ভট্টাচার্যের। ক্ষমতায় আসার পর বিজেপির একাংশের বিরুদ্ধে অভিযোগে অস্বস্তি। বারবার সতর্ক করার পরেও কেন থামছে না অভিযোগ?

ক্ষমতায় আসার ছ'মাস পরেও তোলাবাজি নিয়ে দলের নেতা-কর্মীদের সতর্ক করতে হচ্ছে বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যকে। কখনও রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে টাকা আদায়, কখনও ব্যবসায়ীদের হুমকি, কোথাও আবার বিরোধীদের দলীয় কার্যালয় দখলের অভিযোগ। এ বার সরাসরি থানায় এফআইআর করার নির্দেশ দিলেন শমীক। জানিয়ে দিলেন, বিজেপির পতাকা ব্যবহার করে অন্যায় করলে ছাড় দেওয়া হবে না।

১৩ নভেম্বর বাগুইআটিতে কলকাতা উত্তর শহরতলি সাংগঠনিক জেলার মহিলা মোর্চার বিজয়া সম্মিলনীতে শমীক ভট্টাচার্যের বক্তব্যের বড় অংশ জুড়ে ছিল তোলাবাজি ও দলীয় শৃঙ্খলা। আনন্দবাজারে প্রকাশিত তাঁর বক্তব্য, ''আমাদের দলের রং, পতাকাকে যারা কলঙ্কিত করতে চাইছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে এফআইআর করুন।''

কেন এমন নির্দেশ? শমীকের অভিযোগ, ক্ষমতার পালাবদলের আগে যাঁরা বিভিন্ন এলাকায় তোলাবাজির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তাঁদের একাংশ এখন বিজেপিতে ঢোকার চেষ্টা করছেন। কেউ কেউ দলের পতাকা নিয়ে নিজেদের বিজেপি নেতা বলেও পরিচয় দিচ্ছেন। তাঁদের চিহ্নিত করার নির্দেশ দিয়েছেন রাজ্য সভাপতি। স্পষ্ট করেছেন, কোনও নেতার সঙ্গে ঘুরলেই কেউ বিজেপির নেতা হয়ে যান না।

শুধু এফআইআর করার নির্দেশ নয়, অভিযোগপত্র তাঁর কাছেও পাঠাতে বলেছেন শমীক। মুখ্যমন্ত্রী তথা পুলিশমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নাম উল্লেখ করে প্রশাসনিক ব্যবস্থার কথাও জানিয়েছেন। সংবাদ প্রতিদিনের ১৪ নভেম্বরের প্রতিবেদন অনুযায়ী, দলের পরিচয় ব্যবহার

➲ তিন পাতায়

ছয় মাসে সময়ের প্রথম কলকাতা কী করল?

সুব্রত আচার্য

ক্ষমতার পালাবদল, মানুষের প্রত্যাশা, রাজপথের প্রতিবাদ থেকে বিশ্বরাজনীতির টানাপোড়েন- প্রথম ১১টি সংখ্যায় কীভাবে তুলে এনেছি ছ'মাসের ঘটনাপ্রবাহ? শুধু খবর নয়, বিশ্লেষণের মোড়কে পাঠককে কতটা নতুন স্বাদ দিতে পেরেছি?

সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই এবারের সংখ্যাটাও একটু অন্য রকম করে সাজিয়েছি।

১ জুন ২০২৬। 'সময়ের প্রথম কলকাতা'র প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল। তারপর দেখতে দেখতে প্রায় ছ'মাস। প্রকাশিত হয়েছে ১১টি সংখ্যা। সাংবাদিকতার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থাকলেও নিজের সম্পাদনায় একটি সংবাদপত্র প্রকাশ করার অনুভূতি আলাদা। প্রতিটি সংখ্যার আগে ভেবেছি, কোন খবরটি পাঠকের সামনে তুলে ধরা জরুরি? ঘটনার কোন দিকটি নিয়ে আরও প্রশ্ন তোলা প্রয়োজন? কারণ শুধু কী ঘটেছে, তা জানানোই নয়। কেন ঘটল, তার প্রভাব কোথায় পড়তে পারে, সেটাও বোঝার চেষ্টা আমাদের।

শুরুটা হয়েছিল পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পালাবদলের মধ্য দিয়ে। প্রথম সংখ্যার প্রধান শিরোনাম, 'বাংলার নতুন ক্ষমতার করিডর'। নতুন সরকার এসেছে। মানুষের প্রত্যাশাও বেড়েছে। কিন্তু ক্ষমতার পরিবর্তন আর মানুষের জীবনে পরিবর্তন কি এক কথা? সেই প্রশ্ন থেকেই ১৬ জুনের দ্বিতীয় সংখ্যায় '৩০ দিনে শুভেন্দু সরকার জনমুখী রাজনীতির আশা, কড়া শাসনের পরীক্ষা'। ১ জুলাইয়ের তৃতীয় সংখ্যায় 'গুন্ডারাজ খতমে কড়া আইন, বদলের বার্তা বাংলায়'। সরকারি সিদ্ধান্তের খবরের পাশাপাশি তার রাজনৈতিক ও সামাজিক তাৎপর্য খুঁজেছি।

তবে বাংলা মানেই শুধু নবান্ন কিংবা রাজনৈতিক দলের কার্যালয় নয়। ১৬ জুলাইয়ের সংখ্যায় 'বারুইপুরে তিন মৃত্যু, রাষ্ট্র ও সমাজের পরীক্ষা'।

➲ তিন পাতায়



সম্পাদকীয়

রাজনীতিতে প্রতিহিংসা কমুক

পশ্চিমবঙ্গে সরকার বদলেছে। বদলেছে ক্ষমতার সমীকরণ। কিন্তু রাজনৈতিক আচরণ কতটা বদলেছে? এই প্রশ্ন আজ নতুন করে তোলার প্রয়োজন রয়েছে। গণতন্ত্রে ক্ষমতার পালাবদল স্বাভাবিক। অস্বাভাবিক তখনই, যখন রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে শত্রু মনে করা হয়। বিরোধিতা দমনে প্রশাসনকে ব্যবহারের অভিযোগ ওঠে। কিংবা আইনের প্রয়োগ নিয়ে মানুষের মনে সংশয় তৈরি হয়।

সম্প্রতি কালীঘাটে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির সামনে উত্তেজনা ঘিরে বিজেপি ও তৃণমূল কংগ্রেসের মধ্যে পাল্টাপাল্টি অভিযোগ উঠেছে। কলেজ স্ট্রিটে বামপন্থীদের বইয়ের স্টলে হামলার অভিযোগ নিয়েও বিতর্ক হয়েছে। কার অভিযোগ কতটা সত্য, তা তদন্তে নির্ধারিত হোক। কিন্তু রাজনৈতিক মতপার্থক্যের কারণে কারও সভা, সংগঠন কিংবা মত প্রকাশের অধিকার বাধাগ্রস্ত হওয়া উচিত নয়।

এ প্রসঙ্গে অতীতটাও মনে রাখা প্রয়োজন।

আজকের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বিরোধী দলনেতা থাকাকালীন একাধিক মামলার মুখোমুখি হয়েছিলেন। রাজনৈতিক কর্মসূচিতে বাধা দেওয়ার অভিযোগও তুলেছিলেন। ২০২৩ সালের আগস্টে পূর্ব মেদিনীপুরের খেজুরিতে সভা করার অনুমতি নিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হতে হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে সেই সভা হয়। বিরোধীদের রাজনৈতিক অধিকার নিয়ে তখন প্রশ্ন তুলেছিল বিজেপি।

বর্তমান পরিবহণমন্ত্রী অর্জুন সিংয়ের কথাও স্মরণ করা প্রয়োজন। ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের হলফনামায় তাঁর বিরুদ্ধে ১১৯টি বিচারাধীন ফৌজদারি মামলার উল্লেখ ছিল। সংখ্যাটি নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য। তবে মামলা থাকা আর অপরাধ প্রমাণিত হওয়া এক কথা নয়। একইভাবে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার অভিযোগ উঠলেই সব মামলা ভিত্তিহীন হয়ে যায় না। সত্য নির্ধারণের দায়িত্ব আদালতের।

শুধু রাজনৈতিক নেতারাই নন। আগের সরকারের আমলে সাংবাদিক, ইউটিউবার এবং ডিজিটাল সংবাদকর্মীদের বিরুদ্ধেও মামলা ও গ্রেফতারের ঘটনা ঘটেছে। ২০২৪ সালের নভেম্বরে 'মাধ্যম নিউজ'-এর সঙ্গে যুক্ত দু'জনকে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ। তাঁদের বিরুদ্ধে ভুল তথ্য ছড়ানোর অভিযোগ ছিল। কিন্তু সংবাদ প্রকাশ কিংবা সরকারের সমালোচনাকে কেন্দ্র করে পুলিশি ব্যবস্থা নেওয়া হলে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার প্রশ্নও সামনে আসে।

এই অতীত বর্তমান সরকারের দায়িত্ব আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। একসময় যে অভিযোগ বিজেপি তুলেছিল, ক্ষমতায় এসে সেই অভিযোগের পুনরাবৃত্তি যেন না ঘটে। একই কথা বিরোধীদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। প্রতিবাদ গণতান্ত্রিক অধিকার। কিন্তু প্রতিবাদের নামে হামলা, হুমকি কিংবা অশান্তি কোনওভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।

অপরাধের বিচার হোক। দুর্নীতির তদন্তও হোক। কিন্তু আইন যেন রাজনৈতিক পরিচয় দেখে পথ না বদলায়। শাসক ও বিরোধীর জন্য পুলিশের মানদণ্ড এক হওয়া প্রয়োজন। প্রশাসনের নিরপেক্ষতা কেবল ঘোষণায় নয়, কাজেও বোঝা উচিত।

বাংলার মানুষ দীর্ঘ রাজনৈতিক সংঘাত দেখেছেন। বাম আমল, তৃণমূলের শাসনকাল পেরিয়ে এখন বিজেপির সরকার। প্রতিটি পালাবদলের পরেই নতুন প্রত্যাশা তৈরি হয়েছে। অথচ রাজনৈতিক হিংসা ও প্রতিহিংসার অভিযোগ থেকে পুরোপুরি মুক্ত হতে পারেনি রাজ্য।

ক্ষমতার পরিবর্তন হয়েছে। এবার রাজনৈতিক আচরণেও পরিবর্তন আসুক। অতীতের অন্যায়ের বিচার হোক, কিন্তু নতুন প্রতিহিংসার জন্ম না দিয়ে। গণতন্ত্রে প্রতিপক্ষের অধিকার রক্ষা করা দুর্বলতা নয়, দায়িত্ব। সেই দায়িত্ব পালনের মধ্যেই রয়েছে সুস্থ রাজনৈতিক পরিবেশ গড়ে তোলার সুযোগ।

মধ্যবর্তী নির্বাচনের বার্তা, কতটা শক্তিশালী মার্কিন গণতন্ত্র?

সুব্রত আচার্য



মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সদ্যসমাপ্ত মধ্যবর্তী নির্বাচনে বদলে গিয়েছে ক্ষমতার সমীকরণ। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের রিপাবলিকান পার্টির হাত থেকে কংগ্রেসের দুই কক্ষেরই নিয়ন্ত্রণ চলে যাচ্ছে ডেমোক্র্যাটদের হাতে। অথচ ডোনাল্ড ট্রাম্প এখনও প্রেসিডেন্ট। তাঁর মেয়াদও শেষ হয়নি। তাহলে এই ভোট কেন? কীভাবে হয় মধ্যবর্তী নির্বাচন? এর ফলে প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা কি কমে যায়, নাকি আরও বাড়তে পারে? বিশ্বরাজনীতির অন্যতম প্রধান শক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক কাঠামো আসলে কতটা মজবুত? সদ্যসমাপ্ত নির্বাচন সেই শক্তির কতটা প্রমাণ দিল?

প্রশ্নগুলির উত্তর খুঁজতে গেলে প্রথমেই বুঝতে হবে মার্কিন শাসনব্যবস্থার একটি বিশেষ দিক।

যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন চার বছরের জন্য। কিন্তু কংগ্রেসের নির্বাচনী সময়সূচি আলাদা। প্রেসিডেন্টের মেয়াদের মাঝামাঝি, অর্থাৎ দু'বছরের মাথায় যে নির্বাচন হয়, সেটিই মধ্যবর্তী নির্বাচন। এখানে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন না। নাগরিকেরা ঠিক করেন, দেশের আইনসভায় কোন দলের কতটা প্রতিনিধিত্ব থাকবে।

মার্কিন কংগ্রেসের দুটি কক্ষ;প্রতিনিধি পরিষদ এবং সেনেট। প্রতিনিধি পরিষদে ৪৩৫টি আসন। প্রতি দু'বছর অন্তর সব আসনেই নির্বাচন হয়। সেনেটের সদস্য ১০০ জন। প্রতিটি অঙ্গরাজ্য থেকে দু'জন করে সেনেটর নির্বাচিত হন। তাঁদের মেয়াদ ছ'বছর। তবে সবাই একসঙ্গে নির্বাচনে যান না। প্রতি দু'বছরে প্রায় এক-তৃতীয়াংশ আসনে ভোট হয়। একই সময়ে বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে গভর্নর, আইনসভা ও স্থানীয় প্রশাসনের পদেও নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

কারা ভোট দেন? মার্কিন নাগরিক, যাঁদের বয়স নির্বাচনের দিন অন্তত ১৮ বছর এবং যাঁরা সংশ্লিষ্ট অঙ্গরাজ্যের অন্যান্য যোগ্যতা পূরণ করেন। নর্থ ডাকোটা ছাড়া সব অঙ্গরাজ্যে ভোটার নিবন্ধন প্রয়োজন। কোথাও আগাম ভোট, কোথাও ডাকযোগে ভোটের সুযোগ রয়েছে। কংগ্রেসের সদস্যদের নাগরিকেরা সরাসরি ভোট দেন। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের মতো ইলেক্টোরাল কলেজের ব্যবস্থা এখানে নেই।

এবারের ফলেই বোঝা যাচ্ছে, এই ব্যবস্থার রাজনৈতিক গুরুত্ব কতখানি।

৩ নভেম্বরের ভোটে প্রতিনিধি পরিষদ ও সেনেট;দুই কক্ষেই সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিশ্চিত করেছে ডেমোক্র্যাটিক পার্টি। অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের হিসাব অনুযায়ী, ১২ নভেম্বর পর্যন্ত রিপাবলিকানদের দখলে থাকা প্রতিনিধি পরিষদের ৪৪টি এবং সেনেটের আটটি আসনে জয়ী হয়েছেন ডেমোক্র্যাটরা। কয়েকটি আসনের চূড়ান্ত গণনা তখনও বাকি ছিল।

কেন এমন ফল? অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের ভোটার সমীক্ষায় জীবনযাত্রার ব্যয়, মূল্যবৃদ্ধি, সরকারি দুর্নীতি, ইরান যুদ্ধ এবং গণতন্ত্রের অবস্থা নিয়ে উদ্বেগ উঠে এসেছে। তবে সব ভোটারের সিদ্ধান্ত এক কারণে প্রভাবিত হয়নি। স্থানীয় সমস্যা, প্রার্থীর গ্রহণযোগ্যতা এবং অভিবাসননীতির মতো বিষয়ও গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ডেমোক্র্যাটদের সাফল্য মানেই তাঁদের প্রতিটি নীতির প্রতি সমর্থন, এমন সিদ্ধান্তেও পৌঁছনো যায় না।

কিন্তু এই ফল কি ডোনাল্ড ট্রাম্পের ক্ষমতা কেড়ে নিল?

না। মধ্যবর্তী নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট পদচ্যুত হন না। তাঁর সাংবিধানিক ক্ষমতাও স্বয়ংক্রিয়ভাবে কমে যায় না। তবে প্রেসিডেন্টের দল কংগ্রেসে সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারালে নতুন আইন, বাজেট এবং সরকারি ব্যয়ের সিদ্ধান্তে বিরোধীদের সঙ্গে সমঝোতার প্রয়োজন বাড়ে। প্রশাসনের কাজকর্ম নিয়ে তদন্ত ও জবাবদিহি চাওয়ার সুযোগও বাড়ে।

অন্যদিকে প্রেসিডেন্টের দল দুই কক্ষেই সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলে নিজেদের নীতি কার্যকর করার পথ তুলনামূলক সহজ হয়। কিন্তু তাতেও প্রেসিডেন্টের সাংবিধানিক ক্ষমতা বাড়ে না। অর্থাৎ এই নির্বাচন প্রেসিডেন্টের পদ নয়, আইনসভার সঙ্গে তাঁর ক্ষমতার সম্পর্ক বদলায়।

বিরোধীরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলেই অবশ্য প্রেসিডেন্টকে সরাতে পারেন না। মার্কিন সংবিধানে অভিশংসনের পৃথক ব্যবস্থা রয়েছে। প্রতিনিধি পরিষদ অভিযোগ অনুমোদন করতে পারে। কিন্তু পদচ্যুত করার জন্য সেনেটে উপস্থিত সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থনে দোষী সাব্যস্ত হওয়া প্রয়োজন।

এই ব্যবস্থার মধ্যেই রয়েছে মার্কিন গণতন্ত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। প্রেসিডেন্ট রাষ্ট্র পরিচালনা করেন, কিন্তু আইনসভা তাঁর সব সিদ্ধান্ত মেনে নিতে বাধ্য নয়। বিচার বিভাগেরও পৃথক সাংবিধানিক ভূমিকা রয়েছে। ক্ষমতার এই বিভাজন ও পারস্পরিক নিয়ন্ত্রণই মার্কিন শাসনব্যবস্থার অন্যতম ভিত্তি।

তবে শুধু নিয়মিত নির্বাচন হলেই গণতন্ত্রের শক্তি প্রমাণিত হয় না। নির্বাচনী এলাকার সীমানা নির্ধারণ, প্রচারে বিপুল অর্থের প্রভাব, ভোটাধিকার প্রয়োগের বাধা এবং রাজনৈতিক মেরুকরণ নিয়ে মার্কিন ব্যবস্থাতেও বিতর্ক রয়েছে। ফলে গণতন্ত্রের শক্তি বিচার করতে হয় নির্বাচনের পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানগুলির স্বাধীনতা ও কার্যকারিতা দিয়ে।

আর ২০২৮ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন? মধ্যবর্তী নির্বাচনের ফল তার আগাম ঘোষণা নয়। ২০১০ সালে ডেমোক্র্যাটরা প্রতিনিধি পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারিয়েছিলেন। অথচ ২০১২ সালে বারাক ওবামা আবার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। দু'বছরে রাজনৈতিক পরিস্থিতি বদলাতে পারে।

২০২৬ সালের মধ্যবর্তী নির্বাচনে ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট পদ হারাননি। বদলেছে তাঁর প্রশাসনের সঙ্গে কংগ্রেসের ক্ষমতার সম্পর্ক। আগামী জানুয়ারিতে নতুন কংগ্রেস দায়িত্ব নেওয়ার পর এই পরিবর্তনের বাস্তব প্রভাব স্পষ্ট হবে। মার্কিন গণতন্ত্রের শক্তি শুধু ভোটের ফল বদলানোর মধ্যে নয়, সেই রায় মেনে সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলি কতটা স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে, তার মধ্যেই।

মাত্র ছয় মাস, সামনের পথ আরও কঠিন

শীর্ষেন্দু চক্রবর্তী

দেখতে দেখতে ছ'টি মাস কেটে গেল। অবশ্যই অনেক পথ চলা এখনও বাকি। বাকি রয়েছে অনেক ভাবনাচিন্তাকে বাস্তবায়িত করার কাজও। আজকের দিনে এখানেই একটি সংবাদপত্রের আসল লড়াই। একদিকে নিউজপ্রিন্ট ও কালির অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি। অন্যদিকে ডিজিটাল দুনিয়ার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখা। প্রতিনিয়ত গুচ্ছ গুচ্ছ খবর মানুষ হাতের মুঠোয় পেয়ে যাচ্ছেন। ফলে নতুন করে কাগজ কিনে খবর পড়ার আগ্রহ কিছুটা হলেও কমেছে। এমনটা হওয়া অস্বাভাবিক নয়। তবে এই বাস্তবতাকে স্বীকার করেই ছ'মাস আগে পথচলা শুরু হয়েছিল 'সময়ের প্রথম কলকাতা'র।

এক এবং একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, যতটা সম্ভব নিরপেক্ষতার সঙ্গে খবর ও মতামত তুলে ধরা। এখন প্রশ্ন হতেই পারে, 'যতটা সম্ভব' বলা হল কেন? কারণ আমরা বিশ্বাস করি, কেউই সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ নন। নিরপেক্ষ থাকার চেষ্টা করা যায়, কিন্তু ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গি ও সীমাবদ্ধতার ঊর্ধ্বে ওঠা সবসময় সম্ভব হয় না। সীমাবদ্ধতা সবার রয়েছে। আমাদেরও আছে। আগামী দিনেও থাকবে। সেই সীমাবদ্ধতার মধ্যেই চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। ভালো কিছু করার আকুতি ধরে রাখা।

গত ছ'মাসে রাজ্য সরকারের বেশ কিছু গঠনমূলক কাজের প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশিত হয়েছে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কিত নানা খবর ও তথ্য। 'প্রথম কলকাতা' যেহেতু প্রথম থেকেই দুই দেশের মানুষের কথা বলে, তাই সংবাদপত্রেও গুরুত্বের সঙ্গে জায়গা পেয়েছে দুই বাংলার মানুষের কথা।

শুরু থেকেই লক্ষ্য ছিল, শুধু একটি নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে খবর নিয়ে আলোচনা করা। সেই কারণেই আঞ্চলিক, স্থানীয় ও রাজ্যের খবরের পাশাপাশি গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে আন্তর্জাতিক খবরও।

লেখার শুরুতেই বলেছি, আমরা চেষ্টা করেছি। কিন্তু অনেক পথ চলা এখনও বাকি। হ্যাঁ, কী কী করতে চাই, সে কথাও বলা জরুরি। আঞ্চলিক খবর, সাধারণ মানুষের মনের কথা, তাঁদের প্রয়োজন ও সমস্যার খবর আরও বেশি করে দেওয়া উচিত ছিল। সময়, সুযোগ এবং জায়গার অভাবে এমন অনেক খবর আমরা দিতে পারিনি। আগামী দিনে সেই ঘাটতি পূরণের চেষ্টা করব।

কিন্তু সবচেয়ে বড় সমস্যা আর্থিক সংকট। ছোট প্রতিষ্ঠান। কয়েকজন মানুষের ভালোবাসা, আবেগ আর ইচ্ছাশক্তি। প্রথমে ইউটিউব। তারপর ওয়েবসাইট। পরবর্তীতে সংবাদপত্র। ধীরে ধীরে নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও টিকে থাকার লড়াই। বিজ্ঞাপনের ভয়ানক অভাব। সময় যত এগিয়েছে, বিজ্ঞাপনের সংখ্যা তত কমেছে। আর এই আর্থিক সংকটের মধ্যে টিকে থেকে নিয়মিত খবর প্রকাশ করা এক অসম লড়াই।

ভালো খবর সংগ্রহ, ভালো প্রতিবেদন তৈরি এবং তা যথাযথভাবে প্রকাশ করতে গেলে সবার আগে প্রয়োজন আরও লোকবল। তার জন্য দরকার আর্থিক সঙ্গতি। এখানেই বারবার আটকে যাচ্ছি আমরা। ইচ্ছাশক্তি রয়েছে। কিন্তু সেই ইচ্ছাকে বাস্তবায়িত করার সুযোগ অনেকটাই সীমিত। সামনের পথ কঠিন। সবকিছু শুধু ইচ্ছে দিয়ে হয় না। তাই লড়াইটা আরও কঠিন।

একটা কথা জোর দিয়ে বলতে পারি। কোনও প্রতিবন্ধকতার সামনেই মাথা নত করেনি 'প্রথম কলকাতা'। শত প্রতিকূলতার মধ্যেও এগিয়ে চলেছে। একটি সংবাদপত্রের মেরুদণ্ড তার সম্পাদকীয় বিভাগ। খবরের প্রতি দায়বদ্ধতা, সংবাদ সংগ্রহের আগ্রহ এবং তা পাঠকের কাছে পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা। এই তাগিদ থেকেই প্রকাশিত হয়েছে বিভিন্ন প্রতিবেদন।

আগামী দিনে পাঠকদের আরও অনেক কিছু দেওয়ার স্বপ্ন রয়েছে। দেওয়া উচিত বলেও আমরা বিশ্বাস করি। যেমন গুরুত্ব দিয়ে আন্তর্জাতিক খবর প্রকাশ করে চলেছি, তেমনই স্থানীয় খবরকেও গুরুত্ব দিয়েছি। তবে আগামী দিনে স্থানীয় খবরের উপর আরও বেশি জোর দিতে চাই। একটি স্থানীয় সংবাদপত্র স্থানীয় মানুষের খবরের উপর ভিত্তি করেই নিজের ভিত শক্ত করে। আমরাও সেই চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।

শেষে পাঠকদের কাছে একটি আবেদন। আপনাদের এলাকার কোন খবরগুলি আরও বেশি করে পেতে চান, আমাদের জানান। কোথায় মানুষের সমস্যা, কোথায় প্রশাসনের নজর দেওয়া প্রয়োজন, কোথায় ভালো কাজ হচ্ছে; সেই খবরও পৌঁছে দিন আমাদের কাছে। আপনাদের মতামত চিঠি লিখে পাঠান।

কারণ সংবাদপত্র শুধু প্রকাশকের নয়, পাঠকেরও। আপনাদের সঙ্গে এই যোগাযোগ যত বাড়বে, 'সময়ের প্রথম কলকাতা'র পথচলাও তত বেশি অর্থবহ হয়ে উঠবে।

নতুন ধারার সাংবাদিকতার দলিল
'সময়ের প্রথম কলকাতা'

শম্পা পাল

একটি সংবাদপত্রের জন্ম মানে শুধু নতুন একটি প্রকাশনার সূচনা নয়। তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে সময়কে দেখার, বোঝার এবং ভবিষ্যতের জন্য ধরে রাখার চেষ্টা। সেই ভাবনা নিয়েই পথচলা শুরু করেছিল 'সময়ের প্রথম কলকাতা'। দেখতে দেখতে ছ'মাস। ১ জুন থেকে ১ নভেম্বর ২০২৬ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে ১১টি সংখ্যা। এই অল্প সময়ের মধ্যেই পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, বাংলাদেশ এবং বিশ্বরাজনীতির নানা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা উঠে এসেছে পত্রিকার পাতায়। শুধু ঘটনার বিবরণ নয়, তার পিছনের কারণ ও তাৎপর্য বোঝানোর চেষ্টাও থেকেছে।

আজকের দিনে খবরের অভাব নেই। মোবাইল খুললেই মুহূর্তে মুহূর্তে নতুন খবর। কিন্তু এত খবরের ভিড়ে পাঠক কতটা বুঝতে পারছেন, কোন ঘটনা কেন গুরুত্বপূর্ণ? তার প্রভাব কোথায় পড়তে পারে? এখানেই 'সময়ের প্রথম কলকাতা' একটু আলাদা পথে হাঁটার চেষ্টা করেছে।

পত্রিকাটির প্রথম ছ'মাসের সংখ্যাগুলি দেখলেই সেই চেষ্টার পরিচয় পাওয়া যায়। পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পালাবদল, নতুন সরকারের প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত, আইনশৃঙ্খলা, শাসক ও বিরোধীদের রাজনৈতিক অবস্থান; সবই গুরুত্ব পেয়েছে। তবে রাজনীতির খবর মানেই শুধু নেতাদের বক্তব্য নয়। নাগরিক নিরাপত্তা, সাধারণ মানুষের অধিকার, প্রশাসনের ভূমিকা এবং মানুষের প্রত্যাশার মতো বিষয়গুলিও উঠে এসেছে প্রতিবেদনে।

দেশের বৃহত্তর ঘটনাপ্রবাহও বাদ যায়নি। আন্তর্জাতিক কূটনীতি, ব্রিকসকে ঘিরে আলোচনা, বিশ্বমঞ্চে ভারতের অবস্থান কিংবা ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের নানা দিক পত্রিকার বিষয় নির্বাচনে জায়গা পেয়েছে। বিশ্বরাজনীতির কোনও সিদ্ধান্ত ভারতের উপর কী প্রভাব ফেলতে পারে, আবার সেই প্রভাব পশ্চিমবঙ্গের মানুষের জীবনেও কতটা পৌঁছতে পারে; এমন প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা চোখে পড়েছে।

আমার কাছে পত্রিকাটির আর একটি ভালো দিক, বিষয় নির্বাচনের বৈচিত্র্য। রাজনীতি ও প্রশাসনের পাশাপাশি বাংলার সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং সাধারণ মানুষের গল্পও গুরুত্ব পেয়েছে। রথযাত্রা, দুর্গাপুজো, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জন্মজয়ন্তী থেকে আন্তর্জাতিক মঞ্চে বাঙালি কন্যাদের সাফল্য; বিভিন্ন বিষয়কে নিজস্ব গুরুত্ব দিয়ে তুলে ধরা হয়েছে। ফলে প্রতিটি সংখ্যায় শুধু রাজনৈতিক ঘটনার বিবরণ নয়, সমাজের অন্য ছবিও দেখার সুযোগ পেয়েছেন পাঠক।

সংবাদপত্রের একটি বড় দায়িত্ব হল সময়কে ধরে রাখা। আজ যে ঘটনা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে, কয়েক বছর পরে সেটিই হয়তো ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হয়ে উঠবে। তখন পুরনো পত্রিকার পাতা খুলে বোঝা যাবে, কোন সময়ে কোন বিষয় মানুষের কাছে গুরুত্বপূর্ণ ছিল, কী নিয়ে বিতর্ক হয়েছিল, কোথায় তৈরি হয়েছিল নতুন প্রত্যাশা।

তবে ছ'মাস কোনও সংবাদপত্রের সাফল্য বিচারের জন্য খুব দীর্ঘ সময় নয়। পাঠকের আস্থা অর্জন করতে হয় প্রতিদিন, প্রতিটি সংখ্যায়। তথ্যের নির্ভুলতা, ভিন্ন মতের জায়গা, সংবাদ নির্বাচনে দায়িত্ববোধ এবং ভুল হলে সংশোধনের মানসিকতা; এসবের উপরেই নির্ভর করে একটি সংবাদপত্রের বিশ্বাসযোগ্যতা।

'সময়ের প্রথম কলকাতা'র প্রথম ১১টি সংখ্যায় বিশ্লেষণধর্মী সাংবাদিকতার যে চেষ্টা দেখা গিয়েছে, আগামী দিনে তাকে আরও সমৃদ্ধ করার সুযোগ রয়েছে। বিশেষ করে মাঠের প্রতিবেদন, সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতা এবং বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের মতামত আরও বেশি জায়গা পেলে পত্রিকার নিজস্ব চরিত্র আরও স্পষ্ট হবে।

আমার মনে হয়, একটি সংবাদপত্রের পরিচয় শুধু তার শিরোনামে তৈরি হয় না। তৈরি হয় কোন ঘটনাকে কতটা গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে, কী প্রশ্ন তোলা হচ্ছে এবং পাঠকের সামনে কতটা পরিষ্কারভাবে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হচ্ছে, তার মধ্য দিয়ে।

ছ'মাসে 'সময়ের প্রথম কলকাতা' সেই নিজস্ব পরিচয় গড়ে তোলার চেষ্টা করেছে। পথ এখনও অনেক বাকি। তবে প্রথম ১১টি সংখ্যা পাশাপাশি রাখলে সময়ের একটি ছবি পাওয়া যায়। আগামী দিনে এই ছবির সঙ্গে আরও কত নতুন ঘটনা, নতুন প্রশ্ন এবং মানুষের না-বলা গল্প যুক্ত হয়, সেটাই দেখার।



সত্যিই এক মিলন আসর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতাঃ কেউ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, কেউ সাংবাদিক কিংবা চিত্রসাংবাদিক। কেউ চিকিৎসক, কেউ শিক্ষক। ছিলেন বিভিন্ন পেশার আরও অনেক মানুষ। পেশা ও পরিচয়ের গণ্ডি পেরিয়ে সকলে মিললেন এক অনুষ্ঠানে। গান, কবিতা, গল্প, আড্ডা আর মতবিনিময়ে জমে উঠল বিজয়া সম্মিলনী। সঙ্গে ছিল মিষ্টিমুখের আয়োজন। শিক্ষাবিদ ও জয়নগরের প্রাক্তন বিধায়ক তরুণকান্তি নস্করের উদ্যোগে সম্প্রতি কলকাতার সুবর্ণবণিক সমাজ হলে আয়োজিত হয়েছিল এই মিলন আসর। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এসইউসিআই (কমিউনিস্ট)-এর রাজ্য সম্পাদক চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য, দলের পলিটব্যুরোর সদস্য অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়, প্রাক্তন সাংসদ চিকিৎসক তরুণ মণ্ডল, চিকিৎসক বিপ্লব চন্দ্র-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশিষ্টজনেরা। শুধু শুভেচ্ছা বিনিময়েই সীমাবদ্ধ থাকেনি অনুষ্ঠান। কথায় কথায় উঠে আসে নানা অভিজ্ঞতা। গান ও কবিতার পাশাপাশি চলে খোলামেলা আলাপচারিতা। অনুষ্ঠানে অতিথিদের হাতে তুলে দেওয়া হয় কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'পথের দাবী' উপন্যাসের শতবর্ষ উপলক্ষে প্রকাশিত একটি স্মারক। সঙ্গে ছিল 'দ্য গোল্ডেন বুক অফ বিদ্যাসাগর', 'দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র'-সহ চারটি বই। বিভিন্ন পেশার মানুষের আন্তরিক উপস্থিতি আর সাংস্কৃতিক আয়োজন মিলিয়ে বিজয়া সম্মিলনী হয়ে উঠল সত্যিকারের এক মিলন আসর।

রাজনীতির হাতিয়ার ভাইফোঁটা

শীর্ষেন্দু চক্রবর্তী



এক অদ্ভুত ভাইফোঁটা দেখল বাংলা। রাজনীতির ভাইফোঁটা। যা প্রশ্ন তুলে দিল, এতদিন যা দেখেছি, যা প্রকাশিত হয়েছে, তা কি সবই ছিল ক্ষমতার আড়ালে এক অদ্ভুত রাজনৈতিক প্রচার?

তৃণমূল কংগ্রেসের ভাইফোঁটা। ২০১১ সালে পালাবদলের পর যা আরও ফুলেফেঁপে উঠেছিল। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত থেকে ফোঁটা নেওয়ার জন্য বাড়ির সামনে লম্বা লাইন পড়ে যেত। রাজনৈতিক নেতা থেকে শুরু করে সংবাদমাধ্যমের কর্মীরাও; বাদ যাননি কেউ।

আবার অরূপ বিশ্বাসের মতো রাজনৈতিক নেতারা ভাইফোঁটাকে রঙ্গমঞ্চ বানিয়ে ফেলেছিলেন। বিনোদনজগতের বহু নায়িকা লম্বা লাইন দিয়ে ফোঁটা দিতে আসতেন অরূপ বিশ্বাস, সুজিত বসুদের মতো ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকা নেতা-মন্ত্রীদের। ফোঁটার পর লম্বা-চওড়া ভাষণ। কেউ বলছেন, দাদাকে ফোঁটা দিয়ে জীবনটা শুদ্ধ করলাম। কেউ বলছেন, দাদা আমাদের সবার প্রিয়। দাদার দীর্ঘজীবন কামনা করলাম।

কখনও আবার শোনা যেত, দিদির (মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়) হাত থেকে ফোঁটা না নিলে আমার সারাটা বছর খুব খারাপ যায়। আজকের দিনে সকাল থেকেই মনটা খুব উতলা হয়ে ওঠে, কখন দিদির কাছে আসব, সেটা ভেবে।

এসব কথা শুনতে বেশ ভালো লাগত আমবাঙালির। অনেকে হয়তো বিশ্বাস করতেও শুরু করেছিলেন। সত্যিই তো, ভাই-দিদির এক অকৃত্রিম সম্পর্ক!

২০২৬ সালের ৪ মে। শুধু সরকার পরিবর্তন হয়নি। সেই পালাবদল চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে, ভাইফোঁটার নামে বিনোদনের যে দৃশ্যটা বেশ কয়েক বছর ধরে বাংলার মানুষ দেখেছেন, তা আসলে কতটা আন্তরিক ছিল, সেই প্রশ্ন থেকেই যায়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে ফোঁটা নিতে আসতেন যাঁরা, তাঁরা আজ মুখ ফিরিয়েছেন। শুধু মুখ ফেরাননি, এখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে কটু কথা বলতেও তাঁদের বাধছে না। ভাইফোঁটার দিন কালীঘাটের যে বাড়ি গমগম করত, এ বছর সেখানে ছিল শুধুই নিস্তব্ধতা। ক্ষমতা চলে যাওয়ায় নিজের ভাইও ফোঁটা নিতে আসেননি। মুখ ফিরিয়েছেন রাজনৈতিক নেতারাও। আর অরূপ বিশ্বাসের মতো 'স্টেজ শো' করা মানুষজনের দপ্তর খাঁ খাঁ করছে।

ভাইফোঁটার মতো এক পবিত্র অনুষ্ঠানকে এভাবে রাজনীতির ময়দানে নামানো কি খুব দরকার ছিল? ভাই-বোনের সম্পর্ক নিয়ে এইভাবে রাজনীতি করে আদতে কি মানুষের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করা হল না? ভাইফোঁটাকে রাজনীতির ময়দানে নামিয়ে কী পেলেন রাজনৈতিক নেতারা?

আরও একটা প্রশ্ন। তৃণমূল গত ১৫ বছর যে ছবিটা তুলে ধরেছিল, বর্তমান সরকারও কিন্তু তার বাইরে এখনও যেতে পারেনি। জল্পনাটা এখানেই...

তুরস্ক সফরে কী পেল ঢাকা?

➲ চার পাতার পর

মূল্যায়নে শুধু প্রশংসা নেই, প্রশ্নও রয়েছে। যুগান্তর-এর ১৪ নভেম্বরের প্রতিবেদন অনুযায়ী, সংসদের প্রধান বিরোধী দল জামায়াতে ইসলামী প্রধানমন্ত্রীর পাঁচ দফা জলবায়ু প্রস্তাবকে সমর্থন জানিয়েছে। একই সঙ্গে দলের সংসদ সদস্য মাহবুবুল আলম সালেহী জলবায়ু তহবিলের স্বচ্ছ ব্যবহার এবং ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের কাছে অর্থ পৌঁছনোর নিশ্চয়তা চেয়েছেন। সম্মেলনে সরকারি প্রতিনিধিদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা না পাওয়ার অভিযোগও তুলেছেন তিনি। রাজনৈতিক মতপার্থক্যের মধ্যেও জলবায়ুর মতো জাতীয় স্বার্থের প্রশ্নে এই সমর্থন তাৎপর্যপূর্ণ। তবে বিরোধীদের তোলা স্বচ্ছতার প্রশ্নও গুরুত্বের দাবি রাখে। তাহলে তুরস্ক সফরের লাভ কোথায়? আপাতত আন্তর্জাতিক মঞ্চে বাংলাদেশের দাবি তুলে ধরা, গুরুত্বপূর্ণ দেশগুলির সঙ্গে সম্পর্ক এগিয়ে নেওয়া এবং ভবিষ্যৎ বিনিয়োগের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা; এই তিনটি বিষয় সামনে এসেছে। যদিও নতুন কোনও বড় আর্থিক বরাদ্দ বা দ্বিপক্ষীয় চুক্তির ঘোষণা এখনও পাওয়া যায়নি।

এখন নজর থাকবে আলোচনার বাস্তব ফলাফলে। আন্তালিয়ায় যে প্রতিশ্রুতি ও সম্ভাবনার কথা উঠেছে, তা কতটা বিনিয়োগ, প্রকল্প এবং জলবায়ু সহায়তায় পরিণত হয়, সেটাই বাংলাদেশের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কূটনীতির সাফল্য শেষ পর্যন্ত বৈঠকের সংখ্যায় নয়, দেশের মানুষ তার কতটা সুফল পান, সেই হিসেবেই বিচার হবে।

কৃষ্ণনগরে রাজকীয় ঐতিহ্য

➲ চার পাতার পর

দৃশ্য দেখতে ভিড় জমান অসংখ্য দর্শনার্থী। অনেকের কাছে পুজোর দিনগুলির মতো বিসর্জনের আয়োজনও সমান আকর্ষণীয়। চন্দননগরের এই পরিচয় একদিনে তৈরি হয়নি। ফরাসি শাসনের স্মৃতি বহন করা শহরটির বাণিজ্যিক গুরুত্ব, স্থানীয় ব্যবসায়ীদের উদ্যোগ, আলোকশিল্পীদের দক্ষতা এবং পুজো কমিটিগুলির দীর্ঘদিনের আয়োজন; সব মিলিয়েই গড়ে উঠেছে এই ঐতিহ্য। পারিবারিক পুজোর পাশাপাশি বারোয়ারি আয়োজনের বিস্তারও উৎসবকে মানুষের আরও কাছে নিয়ে এসেছে।

তাই কৃষ্ণনগর আর চন্দননগরকে জগদ্ধাত্রী পুজোর প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দেখার প্রয়োজন নেই। কৃষ্ণনগরে রাজকীয় ঐতিহ্য ও পুরনো আরাধনার টান। চন্দননগরে আলো, বিশাল প্রতিমা আর বিসর্জনের শোভাযাত্রা। দুই শহরের পুজোর নিজস্ব ইতিহাস, নিজস্ব আকর্ষণ। জগদ্ধাত্রী আরাধনার ইতিহাস নিয়ে বিতর্ক থাকতেই পারে। কিন্তু চন্দননগর যে আলোকশিল্প আর উৎসবের আয়োজনকে বাংলার এক স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক পরিচয়ে পৌঁছে দিয়েছে, তা নিয়ে সংশয়ের অবকাশ নেই।

ছয় মাসে সময়ের প্রথম কলকাতা

➲ এক পাতার পর

১ আগস্টের সংখ্যায় 'কলকাতার মিছিলে হাঁটল তিন প্রশ্ন'। মানুষের নিরাপত্তা, নাগরিক অধিকার এবং প্রতিবাদের রাজনীতিও আমাদের আলোচনায় এসেছে। কোথাও প্রশাসনের ভূমিকা, কোথাও সমাজের দায়। প্রশ্ন তোলার জায়গা থেকে সরে আসিনি।

স্বাধীনতা দিবসের আবহে ১৬ আগস্টের ষষ্ঠ সংখ্যায় প্রধান শিরোনাম ছিল 'সংগ্রাম পেরিয়ে বিশ্বশক্তির পথে ভারত'। স্বাধীনতার দীর্ঘ যাত্রায় ভারতের অর্জন ও ভবিষ্যতের সম্ভাবনা তুলে ধরেছি। তারপর ১ সেপ্টেম্বরের সপ্তম সংখ্যায় আবার পশ্চিমবঙ্গ। প্রশ্ন তুলেছি, 'একশোয় কত পেল বিজেপি সরকার?' নতুন সরকারের প্রথম একশো দিনের কাজের হিসেব খুঁজেছি।

১৬ সেপ্টেম্বরের অষ্টম সংখ্যা আমাদের নিয়ে গিয়েছে আন্তর্জাতিক কূটনীতির আলোচনায়। 'ভারতের মাস্টার স্ট্রোক'; এই শিরোনামে বিশ্বরাজনীতির টানাপোড়েনে ভারতের অবস্থান বিশ্লেষণের চেষ্টা করেছি। পশ্চিমবঙ্গের খবর দিয়ে শুরু হলেও দেশের সীমানায় আমাদের আগ্রহ থেমে থাকেনি। আন্তর্জাতিক ঘটনাপ্রবাহে ভারতের লাভ-ক্ষতির হিসেবও গুরুত্ব পেয়েছে। কারণ আজকের পৃথিবীতে কোনও দেশের রাজনীতি কিংবা অর্থনীতি একা চলে না। দিল্লির সিদ্ধান্তের প্রভাব যেমন কলকাতায় পড়ে, তেমনই আন্তর্জাতিক রাজনীতির অনেক ঘটনার অভিঘাতও পৌঁছে যায় আমাদের জীবনে।

১ অক্টোবরের নবম সংখ্যায় 'সরকারে শুভেন্দু, সংগঠনে শমীক, ছুটছে বদলের বাংলা'। সরকার পরিচালনা আর রাজনৈতিক সংগঠনের দায়িত্ব; দুইয়ের সম্পর্ককে সামনে এনেছি। ১৬ অক্টোবরের দশম সংখ্যায় আবার অন্য ছবি। 'মায়ের আবাহন, উৎসবের বাংলা'। রাজনীতির পাশাপাশি উৎসব, সংস্কৃতি ও বাঙালির আবেগও জায়গা পেয়েছে প্রথম পাতায়। কারণ বাংলাকে জানতে হলে তার রাজনীতির পাশাপাশি সমাজ ও সংস্কৃতিকেও বুঝতে হবে।

আর ১ নভেম্বরের একাদশ সংখ্যা? 'পালাবদলের বাংলা, প্রতিশ্রুতির পরীক্ষা'। প্রথম সংখ্যায় যে নতুন ক্ষমতার কথা লিখেছিলাম, পাঁচ মাস পরে তার কাজের হিসেবেই ফিরে এসেছি। আমার কাছে এই ধারাবাহিকতাটাই গুরুত্বপূর্ণ। সরকার গঠনের দিন যে প্রশ্ন তোলা হয়, কয়েক মাস পরে তার উত্তর খোঁজার দায়িত্বও সংবাদপত্রের।

এই ১১টি সংখ্যা পাশাপাশি রাখলে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি, সমাজ, ভারতের অগ্রগতি, আন্তর্জাতিক কূটনীতি এবং বাংলার সংস্কৃতির একটি সময়চিত্র পাওয়া যায়। সবকিছু নিখুঁতভাবে করতে পেরেছি, এমন দাবি আমার নেই। সীমিত পরিসরে কাজ করতে গিয়ে শিখেছি, কোথায় আরও ভালো করা প্রয়োজন। সহকর্মীদের পরিশ্রম, প্রতিবেদকদের খোঁজখবর, লেখকদের নিজস্ব মত এবং পাঠকদের প্রতিক্রিয়া আমাদের এই পথচলার শক্তি জুগিয়েছে।

আমাদের সম্পাদকীয় নীতির কেন্দ্রে রয়েছে পাঠকের প্রতি দায়বদ্ধতা। নিরপেক্ষতার ছদ্মবেশ নয়। খবরকে ভেঙে, তথ্য যাচাই করে, নানা দিক খতিয়ে দেখে বিশ্লেষণ তুলে ধরাই আমাদের চেষ্টা। কোনও রাজনৈতিক শিবিরের মন জোগানো নয়। আবার কারও বিরোধিতা করাই আমাদের সাংবাদিকতার উদ্দেশ্য হতে পারে না। যে সিদ্ধান্ত প্রশংসার যোগ্য, তার প্রশংসা করতে দ্বিধা নেই। যেখানে প্রশ্ন তোলা প্রয়োজন, সেখানেও পিছিয়ে থাকার কারণ দেখি না। কথার জোর নয়, তথ্যের জোরেই কথা বলতে চাই।

আজকের খবর আগামী দিনে ইতিহাসের উপাদান হয়ে উঠতে পারে। সেই ভাবনা থেকেই প্রথম ১১টি সংখ্যাকে আমি সময়ের দলিল হিসেবে দেখি। হয়তো কয়েক বছর পরে এই পাতাগুলি উল্টে কোনও পাঠক বুঝতে চাইবেন, ২০২৬ সালের পশ্চিমবঙ্গ কোন পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল। ভারতকে ঘিরে কী প্রত্যাশা তৈরি হয়েছিল। কোন ঘটনায় মানুষ প্রতিবাদ করেছিলেন, আর কোন প্রশ্নের উত্তর তখনও পাওয়া যায়নি। সংবাদপত্রের পুরনো পাতার মূল্য তো এখানেই।

আর একটা কথা ব্যক্তিগতভাবে বলতে চাই। সংবাদপত্র প্রকাশের উদ্যোগ আমাদের, কিন্তু তাকে অর্থবহ করে তোলেন পাঠকেরা। আপনারা পড়ছেন, প্রশ্ন করছেন, ভুল ধরিয়ে দিচ্ছেন, পরামর্শ দিচ্ছেন; এটাই আমার কাছে সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি।

প্রথম কলকাতা আপনার জন্যই। পাশে থাকুন। ভুল হলে ধরিয়ে দিন, প্রশ্ন করুন, পরামর্শ দিন। আপনার সেই অধিকারকে সম্মান করেই আগামী দিনেও পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, বাংলাদেশ ও বিশ্বের ঘটনাপ্রবাহকে তথ্যের ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করে তুলে ধরার চেষ্টা অব্যাহত রাখব।

ছ'মাসের এই পথচলা শেষ কথা নয়। বরং আরও দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার শুরু।

‘তোলাবাজি রুখো’, কঠোর বিজেপি!

➲ এক পাতার পর

করে অরাজকতা চালালে জেলে যেতে হতে পারে বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি।

তবে এই সতর্কবার্তা নতুন নয়। ১ আগস্ট রাজারহাটে এক অনুষ্ঠানে তোলাবাজি বন্ধ করতে দলীয় কর্মীদের ১৫ দিনের সময়সীমা বেঁধে দিয়েছিলেন শমীক ভট্টাচার্য। সেদিনই জানিয়েছিলেন, প্রয়োজনে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এরপর ১৮ আগস্ট নিউ টাউনে বিধায়ক ও জেলা সভাপতিদের প্রশিক্ষণ শিবিরেও একই বার্তা দেন। ক্ষমতার অপব্যবহার করলে জনপ্রতিনিধিদেরও ছাড় দেওয়া হবে না বলে সতর্ক করেন। তিন মাসের ব্যবধানে আবার একই অভিযোগ ঘিরে প্রকাশ্যে সরব হতে হল তাঁকে। রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পরে বিজেপির কিছু নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধে বিরোধীদের কার্যালয় দখল, হামলা ও তোলাবাজির অভিযোগ উঠেছে। এই সময়ের ১৪ নভেম্বরের প্রতিবেদন অনুযায়ী, এমন অভিযোগে দলের কয়েকজনের বিরুদ্ধে কারণ দর্শানোর নোটিস ও সাসপেন্ড করার মতো সাংগঠনিক পদক্ষেপও করা হয়েছে। কিন্তু অভিযোগ যে পুরোপুরি থামেনি, রাজ্য সভাপতির সাম্প্রতিক বক্তব্যেই তার ইঙ্গিত মিলছে।

১৩ নভেম্বরের সভায় আরও একটি রাজনৈতিক প্রশ্ন তুলেছেন শমীক। তাঁর অভিযোগ, আগের শাসকদলের সঙ্গে যুক্ত কিছু ব্যক্তি এখন বিজেপির পরিচয় ব্যবহার করে নিজেদের প্রভাব বজায় রাখতে চাইছেন। তাঁদের দলে জায়গা করে দেওয়ার বিরুদ্ধেও সতর্ক করেছেন তিনি।

অন্যদিকে প্রতিহিংসার রাজনীতি থেকে দূরে থাকার কথাও বলেছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি। এই সময়ের প্রতিবেদন অনুযায়ী, নির্বাচনে জয়ের পরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁকে প্রতিহিংসা ও বিভাজনের রাজনীতি না করার পরামর্শ দিয়েছিলেন বলে সভায় দাবি করেন শমীক। তবে রাজনৈতিক সৌজন্যকে দুর্বলতা ভাবার সুযোগ নেই বলেও জানিয়েছেন। এখানেই বিজেপির সামনে কঠিন পরীক্ষা। ক্ষমতায় আসার আগে তোলাবাজি ও রাজনৈতিক সন্ত্রাসের অভিযোগে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সরব ছিল দলটি। এখন ক্ষমতায় এসে নিজেদের একাংশের বিরুদ্ধেই একই ধরনের অভিযোগ শুনতে হচ্ছে। ফলে শমীকের কঠোর বার্তা নিছক সাংগঠনিক সতর্কতা নয়, শাসকদলের ভাবমূর্তির সঙ্গেও জড়িয়ে গিয়েছে।

প্রশ্ন অবশ্য থেকেই যাচ্ছে। এত সতর্কবার্তার পরেও অভিযোগ উঠছে কেন? কতজনের বিরুদ্ধে এফআইআর হয়েছে? দলীয় স্তরে কতজনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে? আর সেই ব্যবস্থার পরে পরিস্থিতি কতটা বদলেছে?

তোলাবাজি বন্ধের নির্দেশ স্পষ্ট। এবার দেখার, দলের পতাকার আড়ালে অন্যায় করলে বিজেপি নিজের কর্মীদের বিরুদ্ধে কতটা কঠোর হতে পারে।

একাই একশ শুভেন্দু

➲ এক পাতার পর

হলে সমন্বয়ক নিয়োগের বিকল্প ব্যবস্থার কথাও জানান। বিরোধীরা অবশ্য এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছে।

১৩ নভেম্বর নবান্নে আবাস প্রকল্পের দ্বিতীয় কিস্তির অর্থ প্রদান ছিল অন্যতম বড় কর্মসূচি। রাজ্যের ৭ লক্ষ ১৭১ জন উপভোক্তার জন্য ৪ হাজার ২০১ কোটি টাকার বেশি বরাদ্দ করা হয়। মাথাপিছু ৬০ হাজার টাকা করে তাঁদের অ্যাকাউন্টে পাঠানোর ব্যবস্থা হয়।

এই অনুষ্ঠানেই আগের তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে আক্রমণ শানান মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, "সরকার বদলালে দ্বিতীয় কিস্তির টাকা মিলবে না বলে অপপ্রচার চালানো হয়েছিল।" নতুন সরকার সেই আশঙ্কা ভুল প্রমাণ করেছে বলে দাবি করেন তিনি।

আবাস প্রকল্পে অনিয়ম নিয়েও কড়া অবস্থান নেন শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর দাবি, যাচাইয়ে ৫৭ হাজার ভুয়ো নাম পাওয়া গিয়েছে। ১২ হাজার অযোগ্য প্রাপকের মধ্যে এক হাজার জন টাকা ফেরত দিয়েছেন। বাকিদের ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত সময় দেওয়া হয়েছে। প্রয়োজনে বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন ও সিআইডি তদন্তের কথাও জানান মুখ্যমন্ত্রী।

একই দিনে নবান্নে চালু হয় 'পুলিশ মিত্র' অ্যাপ। সাধারণ মানুষ নিজের এলাকার দায়িত্বপ্রাপ্ত পুলিশ আধিকারিকের পরিচয় ও যোগাযোগের তথ্য জানতে পারবেন। পুলিশের আধুনিকীকরণে কেন্দ্রীয় সংস্থা বিউরো অফ পুলিশ রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টের সঙ্গে সমঝোতাপত্রও স্বাক্ষরিত হয়।

নভেম্বরের প্রথম ১৪ দিনের কর্মসূচিতে প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের পাশাপাশি রাজনৈতিক বার্তাও স্পষ্ট। চা-শ্রমিকদের সহায়তা থেকে আবাসের টাকা, নিয়োগের প্রতিশ্রুতি থেকে পুলিশ সংস্কার; একের পর এক উদ্যোগ সামনে এনেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

তবে ঘোষণার পর এবার বাস্তবায়নের পালা। ৩০ নভেম্বরের মধ্যে বকেয়া ডিএ মেটে কি না, নিয়োগ প্রক্রিয়া কতটা এগোয় এবং সরকারি প্রকল্পের সুবিধা মানুষের কাছে পৌঁছয় কি না; সেই হিসেবেই আগামী দিনে বিচার হবে এই দু'সপ্তাহের প্রশাসনিক তৎপরতা।

হাসিনা, ডিসেম্বর এবং না

➲ এক পাতার পর

সম্ভাব্য শর্তের কথা জানানো হয়।

প্রথম শর্ত, শেখ হাসিনাকে ফিরিয়ে নেওয়ার দায়িত্ব নিতে হবে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে। সামরিক বিমানে অথবা স্থলসীমান্তে তাঁকে গ্রহণ করার ব্যবস্থা করতে হবে।

দ্বিতীয় শর্ত, বাংলাদেশে তাঁর মৃত্যু দণ্ডের বিরুদ্ধে আপিল এবং নতুন করে ন্যায়সংগত বিচারের সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে।

প্রশ্ন শুধু শেখ হাসিনাকে বাংলাদেশে পৌঁছে দেওয়ার নয়। তাঁর নিরাপত্তা এবং বিচার নিয়েও দিল্লির উদ্বেগের কথা উঠে এসেছে বিবিসির প্রতিবেদনে।

তবে ভারত সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে এই দুটি শর্ত ঘোষণা করেনি। ১৩ নভেম্বর বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল সাংবাদিকদের প্রশ্নে নির্দিষ্ট মন্তব্য করেননি। প্রত্যর্পণকে আইনি বিষয় বলেই উল্লেখ করেছেন।

এর মধ্যেই ১৪ নভেম্বর নতুন বক্তব্য দিলেন বাংলাদেশের আইনমন্ত্রী মো. আসাদুজ্জামান। ঢাকায় সাংবাদিকদের তিনি জানান, মৃত্যু দণ্ডের বিরুদ্ধে আপিলের নির্ধারিত ৩০ দিনের সময়সীমা পার হয়ে গিয়েছে। তাঁর ব্যাখ্যায়, আন্তর্জাতিক অপরাধ (ট্রাইব্যুনাল) আইন, ১৯৭৩-এর ২১ ধারার অধীনে শেখ হাসিনার আর আপিলের সুযোগ নেই।

এর আগে একই অবস্থান জানিয়েছিলেন প্রধান কৌঁসুলি আমিনুল ইসলাম। যদিও বাংলাদেশের অ্যাটর্নি জেনারেল মো. রুহুল কুদ্দুস কাজল এর আগে বলেছিলেন, নির্ধারিত সময় পেরিয়ে আপিল করা হলে আদালত তা গ্রহণ করবে কি না, সেই সিদ্ধান্ত আদালতের।

অর্থাৎ আপিলের প্রশ্নেও আইনি ব্যাখ্যার ফারাক রয়েছে।

বিবিসিতে উদ্ধৃত ভারতীয় সূত্রের দাবি অনুযায়ী দিল্লি যে নিশ্চয়তা চাইছে, বাংলাদেশের আইনমন্ত্রীর সর্বশেষ বক্তব্য তার বিপরীতে দাঁড়াচ্ছে।

ঢাকা আগেই শেখ হাসিনার প্রত্যর্পণ চেয়েছে। ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে প্রথম আনুষ্ঠানিক অনুরোধ। ২০২৫ সালের নভেম্বরে মৃত্যু দণ্ডের রায়ের পর ফের অনুরোধ পাঠানো হয়।

কিন্তু প্রত্যর্পণের দাবি জানানো আর কাউকে হস্তান্তর করা এক নয়। ভারত-বাংলাদেশের প্রত্যর্পণ চুক্তিতে আইনি প্রক্রিয়া ও নির্দিষ্ট বিধান রয়েছে।

ডিসেম্বরের আগে এই জট ছাড়ানোই দ্বিতীয় বড় পরীক্ষা।

তৃতীয় কারণ ডিসেম্বর কি ফেরার সময়, না রাজনৈতিক চাপের কৌশল?

২০২৪ সালের ৫ আগস্ট বাংলাদেশ ছেড়ে ভারতে আসেন শেখ হাসিনা। ২০২৫ সালের ১৭ নভেম্বর বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল মানবতাবিরোধী অপরাধের মামলায় তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেয়। শেখ হাসিনা অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।

১০ জুলাই রয়টার্সকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছিলেন, ডিসেম্বর নাগাদ আওয়ামী লিগের জ্যেষ্ঠ নেতাদের সঙ্গে বাংলাদেশে ফিরে আদালতে আত্মসমর্পণ করতে চান। নভেম্বরেও সেই পরিকল্পনা প্রত্যাহারের কোনও ঘোষণা আসেনি। কিন্তু ফেরার দিনও জানানো হয়নি।

কেন ডিসেম্বর?

আওয়ামী লিগের কার্যক্রমের উপর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। শেখ হাসিনার অনুপস্থিতিতে দলটির রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। দেশে ফেরার ঘোষণা সমর্থকদের নতুন প্রত্যাশা দিতে পারে। আবার ডিসেম্বর পেরিয়ে গেলে সেই প্রত্যাশাই নেতৃত্বের কাছে নতুন প্রশ্ন হয়ে ফিরতে পারে।

এখান থেকেই শুরু ডিসেম্বরের রাজনীতি।

বিবিসি বাংলার প্রতিবেদনে উদ্ধৃত ভারতীয় কর্মকর্তাদের একাংশের ধারণা, ঢাকা প্রকাশ্যে প্রত্যর্পণ চাইলেও শেখ হাসিনা ফিরলে বাংলাদেশের বর্তমান সরকারের সামনে নতুন রাজনৈতিক অস্থিরতা তৈরি হতে পারে। তাই প্রত্যাবর্তন নিয়ে ঢাকাও সতর্ক।

কিন্তু বাংলাদেশের ঘোষিত অবস্থান অন্য কথা বলছে। শেখ হাসিনাকে ফেরানোর দাবিতেই অনড় সরকার। প্রত্যর্পণ চুক্তির ভিত্তিতে তাঁকে ফিরিয়ে আনার কথাই বলছে ঢাকা।

তাহলে হিসেবটা কী দাঁড়াচ্ছে?

শেখ হাসিনা স্বেচ্ছায় ফিরতে চাইছেন। ঢাকা চাইছে প্রত্যর্পণের মাধ্যমে তাঁকে ফেরাতে। দিল্লি প্রকাশ্যে কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানায়নি।

ফলে ডিসেম্বরের ঘোষণা রাজনৈতিক চাপ তৈরির হাতিয়ারও হয়ে উঠতে পারে। শেখ হাসিনা ফিরতে পারলে তাঁর রাজনৈতিক উদ্যোগ নতুন মাত্রা পাবে। না ফিরলে কেন ফেরা সম্ভব হল না, সেই দায় নিয়ে দিল্লি, ঢাকা এবং শেখ হাসিনার মধ্যে নতুন বিতর্ক তৈরি হতে পারে।

ডিসেম্বরের আগে কী বদলাতে হবে?

তিনটি বিষয় এখনও অমীমাংসিত। শেখ হাসিনার ফেরার স্বীকৃত আইনি পথ, তাঁর নিরাপত্তা ও বিচার নিয়ে দুই দেশের সমঝোতা এবং প্রত্যাবর্তনের নির্দিষ্ট ব্যবস্থা।

নভেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত কোনওটিরই চূড়ান্ত নিষ্পত্তি প্রকাশ্যে আসেনি।

ডিসেম্বর আসতে আর বেশি দেরি নেই। অথচ শেখ হাসিনার ফেরার দিন নেই। দিল্লি ও ঢাকার যৌথ ঘোষণা নেই। প্রত্যর্পণ কিংবা স্বেচ্ছায় ফেরার নির্দিষ্ট ব্যবস্থাও সামনে আসেনি।

ডিসেম্বরের আগে সমঝোতা হতে পারে। কিন্তু এখনও তার কোনও ঘোষণা নেই। এখন পর্যন্ত প্রকাশিত তথ্য শেখ হাসিনার ডিসেম্বর পরিকল্পনার পক্ষে দাঁড়াচ্ছে না।

ঘোষণা আছে। চিঠি আছে। কূটনৈতিক আলোচনার খবরও আছে। নেই শুধু ফেরার চূড়ান্ত ব্যবস্থা। ডিসেম্বরের রাজনীতিতে আপাতত সবচেয়ে বড় শব্দটি তাই- 'না'।



তুরস্ক সফরে কী পেল ঢাকা?

জলবায়ু কূটনীতিতে নতুন সুযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদনঃ আন্তর্জাতিক মঞ্চে বাংলাদেশের পাঁচ দফা প্রস্তাব, রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ানের সঙ্গে বৈঠক। বাণিজ্য, বিনিয়োগ ও জলবায়ু সহযোগিতায় নতুন সম্ভাবনা দেখছে ঢাকা। বিরোধীদের সমর্থনের পাশাপাশি উঠেছে জবাবদিহির প্রশ্নও।

তুরস্ক সফর শেষে দেশে ফিরেছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। তিন দিনের সফরে আন্তর্জাতিক জলবায়ু সম্মেলনে বক্তব্য রেখেছেন, একাধিক দেশের শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কী পেল ঢাকা? কোনও বড় চুক্তির ঘোষণা না এলেও কূটনৈতিক যোগাযোগ এবং জলবায়ু অর্থায়নের প্রশ্নে এই সফর বাংলাদেশের সামনে কিছু নতুন সুযোগ তৈরি করেছে।

বাংলাদেশের সরকারি বার্তা সংস্থা বাসসের ১৪ নভেম্বর প্রকাশিত প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, তুরস্ক সফর জলবায়ু কূটনীতি ও আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সহযোগিতায় নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলেছে। তবে সম্ভাবনা আর বাস্তব প্রাপ্তি যে এক নয়, সেটিও মনে রাখা প্রয়োজন।

১০ নভেম্বর তুরস্কের আন্তালিয়ায় পৌঁছন তারেক রহমান। ১২ নভেম্বর জাতিসংঘের জলবায়ু সম্মেলন কপ-৩১-এ পাঁচ দফা প্রস্তাব তুলে ধরেন তিনি। আন্তর্জাতিক জলবায়ু অর্থায়নের অন্তত অর্ধেক অভিযোজন খাতে বরাদ্দ, ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলির ঋণের বোঝা কমানো, পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তির সহজলভ্যতা এবং পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তিতে ন্যায্য রূপান্তরের দাবি জানান বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী। তুরস্কের সংবাদ সংস্থা আনাদোলু তারেক রহমানের বক্তব্য তুলে ধরে জানিয়েছে, জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য তুলনামূলকভাবে কম দায়ী দেশগুলিই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। বাংলাদেশের দাবি, বিশ্বে গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণে দেশটির অবদান অর্ধ শতাংশেরও কম। তাই জলবায়ু সহায়তা নতুন ঋণের পরিবর্তে অনুদান হিসেবে দেওয়ার দাবি তুলেছে ঢাকা।

এই অবস্থানকে গুরুত্ব দিয়েছে বাংলাদেশের দ্য ডেইলি স্টারও। ১৩ নভেম্বরের সম্পাদকীয়তে পত্রিকাটি জলবায়ু অর্থায়ন সহজলভ্য করা এবং ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলির ঋণের বোঝা না বাড়ানোর পক্ষে যুক্তি দিয়েছে।

সফরের আর একটি উল্লেখযোগ্য দিক তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ানের সঙ্গে বৈঠক। আনাদোলুর প্রতিবেদন অনুযায়ী, দুই দেশের বাণিজ্য ও প্রতিরক্ষা শিল্পে সহযোগিতা বাড়ানোর বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট। বাংলাদেশের রোহিঙ্গা শরণার্থীদের মানবিক পরিস্থিতি আন্তর্জাতিক আলোচনায় রাখার কথাও জানিয়েছেন তিনি।

বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যম দ্য ডেইলি স্টার জানিয়েছে, সম্মেলনের ফাঁকে চীনের ভাইস প্রেসিডেন্ট হান ঝেং, অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি আলবানিজ এবং উজবেকিস্তানের প্রেসিডেন্ট শাভকাত মিরজিয়োয়েভের সঙ্গেও বৈঠক করেন তারেক রহমান। চীনের সঙ্গে বিনিয়োগ, অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য ও রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসন এবং উজবেকিস্তানের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতা নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

তবে বাংলাদেশের রাজনৈতিক মহলে সফরটির

➲ তিন পাতায়

‘২১ বছর ধরে মেয়ের থেকে দূরে থাকার যন্ত্রণা বয়ে বেড়াচ্ছি’

মাত্র ১৩ বছর বয়সে বিয়ে, কিশোরী বয়সেই মাতৃত্ব। তারপর বিবাহবিচ্ছেদ, মেয়ের সঙ্গে দূরত্ব আর নিজের পরিচয় গড়ে তোলার লড়াই। প্রথম কলকাতার একান্ত সাক্ষাৎকারে জীবনের বহু অজানা কথা জানালেন অভিনেত্রী পল্লবী চট্টোপাধ্যায়। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন শ্রীতমা ভট্টাচার্য, অনুলিখন রণিতা সাহা



বাবা বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়। দাদা প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়। বাংলা চলচ্চিত্রের পরিচিত পরিবারে জন্ম পল্লবী চট্টোপাধ্যায়ের। কিন্তু সেই পরিচিতির আড়ালে তাঁর নিজের জীবনের গল্পটা মোটেও সহজ নয়। মাত্র ১৩ বছর বয়সে বিয়ে। ১৫-১৬ বছর বয়সে মা হওয়া। তারপর ভেঙে যাওয়া সংসার, মেয়ের থেকে দীর্ঘ বিচ্ছেদ। প্রথম কলকাতার সঙ্গে একান্ত কথোপকথনে সেই সব দিনের স্মৃতিতে বারবার আবেগপ্রবণ হয়ে পড়লেন অভিনেত্রী। কথা বললেন পরিবারের সম্পর্ক, নিজের কাজ এবং দীর্ঘদিন ধরে বয়ে বেড়ানো অভিমান নিয়েও।

প্রশ্ন চলচ্চিত্র পরিবারের মেয়ে। ছোটবেলাটা কেমন ছিল?

পল্লবী বাইরে থেকে আমাদের পরিবারকে দেখে অনেকেই হয়তো অন্য রকম ভাবেন। কিন্তু বাড়ির পরিবেশ খুব সহজ ছিল না। বাবা বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে মায়ের বিচ্ছেদের পরে অনেক কিছু বদলে যায়। ছোট থেকেই নানা নিয়মের মধ্যে বড় হয়েছি। পরিবারের পরিচিতি থাকলেও আমার নিজের জীবনটা অন্য রকম ছিল।

প্রশ্ন মাত্র ১৩ বছর বয়সে আপনার বিয়ে হয়েছিল। এত কম বয়সে কীভাবে এমন সিদ্ধান্ত হল?

পল্লবী পারিবারিক পরিস্থিতির চাপে খুব অল্প বয়সেই আমার বিয়ে দেওয়া হয়। দূরসম্পর্কের এক মামার সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল। তখন আমার বয়স মাত্র ১৩। সেই সংসার সুখের হয়নি। ১৫-১৬ বছর বয়সেই আমি আমার মেয়ে রিয়ার মা হই। পরে আমাদের বিবাহবিচ্ছেদ হয়। তবে প্রাক্তন স্বামীকে দোষ দিতে চাই না। আমাদের মধ্যে মতের মিল ছিল না।

প্রশ্ন মেয়ের ছোটবেলার একটি ঘটনা আপনাকে এখনও কষ্ট দেয়। কী হয়েছিল সেদিন?

পল্লবী তখন আমার মেয়ের বয়স চার-পাঁচ বছর। একদিন দাদা প্রসেনজিৎ কয়েকটি পেস্ট্রি নিয়ে বাড়িতে এসেছিল। ছোট মেয়ে, না বুঝেই একটি পেস্ট্রি খেয়ে ফেলেছিল। তার জন্য আমার মা, যাঁকে আমরা মাম্মি বলতাম, মেয়েকে রাস্তায় গিয়ে ভিক্ষা করে সেই পেস্ট্রির দাম নিয়ে আসতে বলেছিলেন। ছোট্ট একটা মেয়ের সঙ্গে এমন আচরণ আমি মেনে নিতে পারিনি। আজও ঘটনাটা ভুলতে পারি না।

এই ঘটনার কথা বলতে গিয়েই আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন পল্লবী। ছোটবেলার সেই স্মৃতি আজও তাঁর মনে কতটা গভীরভাবে রয়ে গিয়েছে, তা বোঝা যায় কথায় কথায়।

প্রশ্ন মেয়েকে নিজের কাছে রাখতে না পারার কষ্ট কি সময়ের সঙ্গে কিছুটা কমেছে?

পল্লবী না। গত ২১ বছর ধরে সেই কষ্ট বয়ে বেড়াচ্ছি। আমি চেয়েছিলাম মেয়েকে নিজের কাছে রাখতে। কিন্তু তখন আমার আর্থিক সামর্থ্য ছিল না। পরিস্থিতিও আমার পক্ষে ছিল না। বাধ্য হয়ে মেয়েকে ওর বাবার কাছে রাখতে হয়েছিল। একজন মায়ের কাছে এই কষ্ট কতটা, সেটা ভাষায় বোঝানো কঠিন।

প্রশ্ন বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের মেয়ে, প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের বোন; এই পরিচয় কি অভিনয়জীবনে আপনাকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছে?

পল্লবী অনেকেই মনে করেন, বাবা বা দাদার পরিচয়ের জন্য আমি সুযোগ পেয়েছি। কিন্তু বাস্তবটা তা নয়। আমি নিজের যোগ্যতায় কাজ করতে চেয়েছি। আমি একজন দক্ষ ডিজাইনারও। নিজের কাজের মাধ্যমে পরিচিত হতে চেয়েছি। কারও পরিচয়ের উপর নির্ভর করে বাঁচতে চাইনি। নিজের আত্মসম্মান আমার কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ।

প্রশ্ন এত ওঠাপড়ার পরে নিজের জীবনকে এখন কীভাবে দেখেন?

পল্লবীর কথায়, জীবনের অনেক কিছু চাইলেও বদলানো যায় না। অতীতের অভিজ্ঞতা, সম্পর্কের ভাঙন কিংবা মেয়ের থেকে দূরে থাকার কষ্ট আজও তাঁর জীবনের অংশ। তবে সেই অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই নিজের সিদ্ধান্ত ও স্বাধীনতাকে গুরুত্ব দিতে শিখেছেন তিনি।

কথোপকথনের একাধিক মুহূর্তে ফিরে এসেছে মেয়ের প্রসঙ্গ। অভিনয়ের সাফল্য কিংবা পরিচিত পরিবারের সদস্য হওয়ার বাইরেও একজন মা হিসেবে তাঁর যে আক্ষেপ, তা আড়াল করেননি পল্লবী চট্টোপাধ্যায়।

চলচ্চিত্র পরিবারের পরিচিতি তাঁর সঙ্গে রয়েছে জন্ম থেকেই। কিন্তু পল্লবী চট্টোপাধ্যায়ের নিজের জীবনের গল্পে রয়েছে বহু না-পাওয়া, ভাঙা সম্পর্ক এবং নিজের পায়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা। সেই গল্পের সবচেয়ে বেদনাদায়ক অধ্যায় হয়ে রয়ে গিয়েছে মেয়ের থেকে দীর্ঘ বিচ্ছেদ। একুশ বছর পেরিয়েও যে কষ্টের কথা বলতে গিয়ে আজও আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন অভিনেত্রী।

বিশেষ দ্রষ্টব্য এই সাক্ষাৎকারে প্রকাশিত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, অভিযোগ ও মতামত সম্পূর্ণভাবে সাক্ষাৎকারদাতা পল্লবী চট্টোপাধ্যায়ের নিজস্ব। সংশ্লিষ্ট বক্তব্যের দায় তাঁর; এর সঙ্গে পত্রিকার সম্পাদকীয় মতের কোনও সম্পর্ক নেই।

অরিজিৎ সিং ভেবে ভুল!
দত্তপুকুরে গান গেয়ে নজরে বসিরহাটের প্রদীপ্ত



সৌমেন রায় চৌধুরী

চেহারা থেকে কোঁকড়ানো চুল, মঞ্চে গান গাওয়ার ভঙ্গিতেও অরিজিৎ সিংয়ের ছাপ। দত্তপুকুরের অনুষ্ঠানে বসিরহাটের যুবককে ঘিরে কৌতূহল। ছবি ও সেলফি তুলতে এগিয়ে এলেন দর্শকেরা। দত্তপুকুরের মঞ্চে মাইক্রোফোন হাতে গান গাইছেন এক যুবক। এলোমেলো কোঁকড়ানো চুল, মুখে হালকা দাড়ি। কখনও চোখ বন্ধ করে গাইছেন, কখনও হাতের ভঙ্গিতে প্রকাশ করছেন গানের আবেগ। প্রথম ঝলকে দেখলে অরিজিৎ সিং বলে ভুল হতে পারে। কিন্তু তিনি জনপ্রিয় গায়ক নন। তাঁর নাম প্রদীপ্ত ঘোষ। বাড়ি উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাটে। সম্প্রতি দত্তপুকুরের একটি অনুষ্ঠানে গান গাইতে এসেছিলেন প্রদীপ্ত। তাঁর সেই অনুষ্ঠানের ভিডিয়ো সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তেই শুরু হয় চর্চা। অনেকেই তাঁর চেহারা ও মঞ্চে গান পরিবেশনের ধরনে অরিজিৎ সিংয়ের সঙ্গে মিল খুঁজে পান। প্রদীপ্তের বাড়ি বসিরহাট পুরসভার ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের থলতিথা এলাকায়। পেশায় তিনি টোল ট্যাক্সের কর্মী। তবে গানও করেন। দত্তপুকুরের অনুষ্ঠানে সাদা শার্ট ও কালো প্যান্ট পরে মঞ্চে উঠেছিলেন তিনি। গান শুরুর পর থেকেই দর্শকদের একাংশের নজর পড়ে তাঁর দিকে। চেহারার মিল দেখে প্রথমে অনেকেই অবাক হয়ে যান। কেউ কাছে গিয়ে ছবি তোলেন, কেউ আবার সেলফির আবদার জানান। অনুষ্ঠানের মঞ্চে গান গাইতে আসা যুবককে ঘিরে এমন কৌতূহল তৈরি হবে, তা হয়তো অনেকেই ভাবেননি। অরিজিৎ সিংয়ের জনপ্রিয়তা দেশজুড়ে। তাঁর গান যেমন শ্রোতাদের কাছে পরিচিত, তেমনই তাঁর সাধারণ সাজপোশাক ও নিজস্ব ভঙ্গিও অনেকের চেনা। সেই গায়কের সঙ্গে প্রদীপ্তের চেহারার মিলই প্রথমে দর্শকদের নজর কেড়েছে। তবে প্রদীপ্তের পরিচয় শুধু অরিজিৎ সিংয়ের মতো দেখতে হওয়াতেই সীমাবদ্ধ নয়। তিনি নিজেও গান করেন। দত্তপুকুরের অনুষ্ঠানে সেই সুযোগেই দর্শকদের সামনে নিজের গান তুলে ধরেছেন।

সমাজমাধ্যমে তাঁর ভিডিয়ো ঘিরে এখন আলোচনা। কেউ দেখছেন অরিজিৎ সিংয়ের সঙ্গে চেহারার মিল, কেউ আগ্রহ দেখাচ্ছেন তাঁর গান নিয়ে।

অরিজিৎ সিংয়ের সঙ্গে মিলের কারণেই আপাতত পরিচিতি পেয়েছেন বসিরহাটের প্রদীপ্ত ঘোষ। কিন্তু সেই পরিচয়ের বাইরে নিজের গান দিয়ে তিনি কতটা জায়গা করে নিতে পারেন, সেটাই দেখার।

কৃষ্ণনগরে রাজকীয় ঐতিহ্য
তবু জগদ্ধাত্রী পুজোয় চন্দননগর কেন এত বিখ্যাত?

সোমা মাইতি



রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের জগদ্ধাত্রী আরাধনা ঘিরে রয়েছে বহু পুরনো কাহিনি। কিন্তু বিশাল প্রতিমা, চোখধাঁধানো আলোকসজ্জা আর বর্ণাঢ্য বিসর্জনের শোভাযাত্রায় নিজের স্বতন্ত্র পরিচয় তৈরি করেছে চন্দননগর। কীভাবে গঙ্গাপাড়ের এই শহর হয়ে উঠল জগদ্ধাত্রী পুজোর অন্যতম প্রধান আকর্ষণ?

জগদ্ধাত্রী পুজোর নাম উঠলেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে চন্দননগর। রাস্তার দু'পাশে আলোর মেলা। বিশাল প্রতিমা, মণ্ডপে মণ্ডপে মানুষের ভিড়। দুর্গাপুজোর রেশ কাটতে না কাটতেই উৎসবের সাজে সেজে ওঠে হুগলির এই শহর। অথচ জগদ্ধাত্রী আরাধনার ইতিহাস খুঁজতে গেলে নদিয়ার কৃষ্ণনগরের কথাও বলতে হয়। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে এই পুজোর বহুল প্রচলিত কাহিনি। তাহলে চন্দননগরের এত খ্যাতি কেন?

ইতিহাস বলছে, জগদ্ধাত্রী পুজোর প্রচলন নিয়ে একাধিক মত রয়েছে।

জনশ্রুতি অনুযায়ী, নদিয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্র একবার নবাবের হাতে বন্দি হয়েছিলেন। মুক্তি পেয়ে ফিরে দেখেন, দুর্গাপুজো শেষ। সেই আক্ষেপের মধ্যেই দেবী জগদ্ধাত্রী তাঁকে স্বপ্নাদেশ দেন। এরপর কৃষ্ণনগরে শুরু হয় দেবীর আরাধনা। অষ্টাদশ শতকের ষাটের দশকে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের উদ্যোগে পুজোটি বিশেষ পরিচিতি পায় বলে মনে করা হয়।

তবে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রই বাংলায় প্রথম জগদ্ধাত্রী পুজো শুরু করেছিলেন, এমন নিশ্চিত প্রমাণ নেই। তাঁরও আগে বাংলার বিভিন্ন জায়গায় দেবী জগদ্ধাত্রীর আরাধনার নিদর্শন পাওয়া যায়। ফলে কৃষ্ণনগরের রাজবাড়ির ঐতিহ্য গুরুত্বপূর্ণ হলেও পুজোর প্রথম সূচনা নিয়ে ইতিহাসবিদদের মতভেদ রয়েছে।

চন্দননগরের ক্ষেত্রেও একই বিতর্ক।

একটি প্রচলিত কাহিনি অনুযায়ী, ফরাসি প্রশাসনের দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী এই শহরে জগদ্ধাত্রী পুজোর প্রচলন করেন। কিন্তু তিনি রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পুজো দেখে চন্দননগরে আরাধনা শুরু করেছিলেন; এই বক্তব্য নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। কারণ ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর মৃত্যু হয় ১৭৫৬ সালে। অথচ কৃষ্ণচন্দ্রের পুজো শুরুর প্রচলিত সময়কাল ১৭৬২ সালের কাছাকাছি।

অন্য একটি মত অনুযায়ী, কৃষ্ণনগরের ব্যবসায়ীদের হাত ধরে চন্দননগরের চাউলপট্টিতে জগদ্ধাত্রী পুজোর প্রসার ঘটে। আজও চাউলপট্টির আদি মায়ের পুজো শহরের অন্যতম পুরনো ঐতিহ্য। আবার ভদ্রেশ্বরের গৌরহাটি তেঁতুলতলার পুজোর সঙ্গে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের দেওয়ান দাতারাম সুরের নামও জড়িয়ে রয়েছে।

তাহলে চন্দননগর কেন এত বিখ্যাত?

প্রথম কারণ, আলোকসজ্জা। চন্দননগরের আলোর শিল্পীদের খ্যাতি এখন বাংলার বাইরেও। একসময় সাধারণ আলোকসজ্জা দিয়ে শুরু হলেও ধীরে ধীরে সেই আলোয় জায়গা পেয়েছে চলমান ছবি। কখনও পৌরাণিক কাহিনি, কখনও সমাজের নানা ঘটনা, কখনও সমসাময়িক বিষয়। আলো দিয়েই যেন গল্প বলেন শিল্পীরা। পুজোর সময় চন্দননগরের রাস্তা তাই হয়ে ওঠে খোলা আকাশের নীচে এক বিরাট প্রদর্শনী।

দ্বিতীয় আকর্ষণ, প্রতিমা। উচ্চতায় বিশাল, অথচ সাজে সাবেকিয়ানার ছাপ। দেবীর মুখশ্রী, অলংকার, সিংহের গড়ন; সব মিলিয়ে চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী প্রতিমার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মণ্ডপসজ্জার বৈচিত্র্য।

তৃতীয় কারণ, বিসর্জনের শোভাযাত্রা। চন্দননগরের পুজোর অন্যতম বড় আকর্ষণ এই শোভাযাত্রা। আলোকসজ্জায় সাজানো প্রতিমা নিয়ে শহরের রাস্তা ধরে এগিয়ে চলে বিভিন্ন পুজো কমিটি। সেই

➲ তিন পাতায়

Printed by Zafrin Chowdhury Published by SUBRATA ACHARYA on behalf of SUBRATA ACHARYA Printed at BANGLA DIGITAL PRINTER, 77 Nirghin Shah Road, South Kazipara, Barasat, North 24 PARGANAS, 700125, West Bengal and Published at 61, BODHIKANAN BHUTBAGAN (KATHGOLA), P.O.: SODEPUR, P.S.: GHOLA, NORTH 24 PARGANAS, WEST BENGAL - 700110.
Editor : **SUBRATA ACHARYA** Mobile: **+91 9830317116** Email : mailprothomkolkata@gmail.com